বাংলা সাহিত্যে জটিল বিতর্কিত বহুমাত্রিক সাহিত্যিক সমরেশ বসু প্রথামাফিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও জীবনের বর্ণবহুল জটিলতা তাঁকে শিখিয়েছে জীবনকে দেখতে ও দেখাতে। তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে দিয়েছেন নির্মম ভাষারূপ। এসম্পর্কে কথা সাহিত্যিকের নিজস্ব বক্তব্য—"সাহিত্যের থেকে জীবন বড়ো, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না। তা সততই অতি জীবন্ত" ('নিজেকে জানার জন্য', গল্প সংগ্রহ-১, সমরেশ বসু।)

জগদ্দলের কমিউনিষ্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের সংস্পর্শে সমরেশের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার ফলে লেখকের অভিজ্ঞতার জগতের ব্যাপ্তি ঘটে যায়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে হয়ে ওঠেন সজাগ ও সতর্ক। ফলে সমরেশের গল্পের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে জগৎ ও জীবন। প্রথম থেকেই তিনি বুঝেছিলেন-" ধ্যান নাই, উপাসনা নাই। তাই এমন ক্রন্দন নাই; নির্গন্থ নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই। মারভুবনও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা। ..... আছে এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।" বস্তুত সেই মনুষ্য ধর্মের কথাই গল্পকার বার বার বলেছেন তাঁর একাধিক গল্পে মূর্ত মানুষের ইমেজে।

সমরেশ বসু আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন-তার এই প্রতিবাদ এতই জীবনাভিজ্ঞতা নির্ভর যে কখনোই মনে হয় না, সমরেশ পরোক্ষ কল্পনার আশ্রয়ে কল্পস্বর্গের প্রতিবাদ আনছেন। তাই তাঁর কোন গল্পের শেষাংশই ধ্বনিত হয় না ধর্মীয় স্বর্গরাজ্য বা প্রচলিত বিমুর্ত আশাবাদ। ১৯৮৬-এর 'দেশ' পত্রিকায় তিনি জানিয়েছেন—"সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে, একান্তভাবে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশ ও কালকে সম্যক জেনে মানবিকতাই হবে মূলতত্ত্ব। এসব সিদ্ধান্ত নিতে পার্টির অতীতের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে।"

সমরেশ বসু মূলত অভিজ্ঞতা নির্ভর কথাকার। এই অভিজ্ঞতা নির্ভরতা লেখকের একদিকে যেমন শক্তির উৎস, অন্যদিকে তেমনি সীমাবদ্ধতাও বটে। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে তাঁর সাহিতের রূপরেখাও। মানুষের মনুষ্যত্বের সন্ধান অর্থে তিনি বুঝেছিলেন টিকে থাকার জন্য হিরামহীন সংগ্রামকে—সে সংগ্রাম পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যাই হোক না কেন। তাই সমরেশ বসুর একাধিক ছোটগল্পে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সংগ্রামের বিচিত্ররূপ।

সমরেশ বসু কথাসহিত্যের বিবিধ অঙ্গণে সদর্পে পদচারণা করেছেন সমান দক্ষতায়। তবে তেত্রিশটি গল্প গ্রন্থে (১৯৫৩-১৯৮৬) সমরেশের সংকলিত গল্পের সংখ্যা দুই

Scanned by CamScanner

শতাধিক। তাঁর প্রথম মুদ্রিত 'শের সর্দার' প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। তবে সমরেশকে গল্পকার হিসেবে পরিচিত ক'রে তোলে ১৯৪৬-এ পরিচয় পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় মুদ্রিত 'আদাব' গল্পটি। নিজ ধর্মের প্রতি গোঁড়ামী ও পরধর্মের প্রতি অবজ্ঞার আর এক নাম ধর্মান্ধতা। এই ধর্মন্ধাতা থেকেই আসে ( ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। যদিও ধর্মের সঙ্গে জাতির কোন সম্পর্ক নেই; তবুও জাতিভেদ ব্যাপারটাকে প্রায়শই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে থাকেন কেউ কেউ। ভুলে যায় মানবতার সেই বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" জাতিভেদের সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা যে কি বীভৎস ও নারকীয় রূপ নিতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমান ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে জাগিয়ে তুলে মুনাফা লোটার সুযোগ খোঁজে যারা, তাদের বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে যে সমস্ত লেখকরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের অন্যতম হলেন সমরেশ বসু।

১৯৪৬ সালে সমরেশ বসু ঢাকার রক্তাক্ত দাঙ্গার পটভূমিতে লেখেন 'আদাব' গল্পটি। ১৯৪৬-এ দাঙ্গার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভেদবুদ্ধির ফসল হলেও সেটি যে একমাত্র সত্য নয়, তাকে অতিক্রম ক'রে সাধারণ গরীব কৃষকের হৃদয়ভরা ভালোবাসার আলোর মধ্যে রয়েছে চিরন্তন মানবতার সত্য; তারই পরিচয় মেলে সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটিতে।

সমকালীন সমস্যা দাঙ্গাকে নিয়ে লেখা 'আদাব' গল্পে সমরেশ বসুর উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ভাবনার মূলে রয়েছে তার নিজস্ব মন ও বেড়ে ওঠার পারিপার্শিকতা। এ প্রসঙ্গে নিতাই বসু মন্তব্য করেছেন—"বাল্যকালে সমরেশ ঢাকা শহরে যেখানে বাস করেছেন, যাদের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁর সেই অবস্থান মেলামেশা তাঁকে প্রথম থেকে সাম্প্রদায়িকতার নোংরামি থেকে মুক্ত রাখে। তাই তিনি নারায়ণগঞ্জের সুতাকলের হিন্দু শ্রমিক ও বুড়ি গঙ্গার সুবইড়ার নায়ের জনৈক মুসলমান মাঝির পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন 'আদাব'-এর মতো গল্প।" (কালকূট-সমরেশ)।

'আদাব' গল্পের ঘটনাস্থল কলকাতার দুটি গলির সংযোগস্থলের রাস্তা। চতুর্দিকে দাঙ্গায় উন্মত্ত সমস্ত মানুষের ছোটাছুটি। হিন্দু মুসলমান"? ( )

এ প্রশ্নের জবাব তারা দুজন দুজনকে দিতে ইতস্তত বোধ করলেও, মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ উল্লাসে দুটি পরস্পরকে আত্মীয় বোধ করে। সেঁতিয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের আলোয় তারা চমকে উঠলেও মুহূর্তমাত্র পরেই তারা জাতিগত পরিচয় ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে পরস্পরের সমব্যথী, দাঙ্গা বিরোধী।

আসলে দাঙ্গা বিরোধী চেতনামূলক গল্প 'আদাব'। নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যে লিখিত সে উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে মানবিকতার উপর। গল্পকার সমরেশ বসু পাঠককে পরিণতিতে, দেখাতে চেয়েছেন কিন্তু মানবিকতার উত্তরণ ঘটে ... তাই নারায়নগঞ্জের সুতোকালের হিন্দু মজুর ( ) উদ্ভুত

Scanned by CamScanner

সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে ক্ষনিকের জন্য পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখলে [illegible] দাঙ্গা চায়না। তাই মুসলমান মাঝির প্রশ্ন—"মারা মারি কইরা হইব কী। [illegible] লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?" [illegible] উপলব্ধি করেছে দাঙ্গার ভয়াবহ পরিণতি "তুমি মরবা, আমি মরুম, আর [illegible] মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব।" আর যাদের কথায় এই দাঙ্গা সেই [illegible] সাততলায় উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর [illegible] মরলাম আমরাই।" এই দুই ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে এই মুহূর্তে পরস্পরের [illegible] নেই, অবিশ্বাস নেই, বিক্ষোভ নেই, কিন্তু বিদ্বেষ আছে একশ্রেণীর মুনষ্যত্ব [illegible] পশু সদৃশ দাঙ্গাবাজ মানুষের প্রতি। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও তারা দুজন [illegible] রাত্রিতে কারফু ভেদ করে পরস্পর 'আদাব' এই হৃদ্যতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। [illegible] গল্পের নামকরণটিও সার্থক।

'আদাব' গল্পে নিম্নশ্রেণীর মানুষ দুটি পরস্পর জাতিগত স্বাভিমান ভুলে গিয়ে [illegible] দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাই বুড়িগঙ্গার নায়ের মুসলমান মাঝি যখন ঈদের [illegible] 'পোলা মাইয়ার' কথা ভেবে দাঙ্গার রক্তাক্ত নারকীয় পরিবেশ কে উপেক্ষা করে, [illegible] না পেলে সাঁতার কেটে বুড়িগঙ্গা পার হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বাড়ী যেতে [illegible] তখন "উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।" কিন্তু মাঝি যখন বলে "ধইরো না ভাই, ছাইড়া দেও। ....পোলামাইয়ারা সব আজ চান্দ দেখ্ছে। কত আশা কইরা [illegible] তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপ্‌জানের কোলে চড়ব। বিবির চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারমু না ভাই—পারমু না—মনটা কেমন করতাছে।" তখন সুতাকলের মজুর আর নায়ের মাঝি তারা দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ মাত্র নয়; তারা একাত্ম হয়ে ওঠে মানবিকতায়, উভয়েই হয়ে ওঠে স্নেহশীল পিতা, দায়িত্ব পরায়ন স্বামী। দাঙ্গাকে পিছনে ফেলে বড়ো হয়ে ওঠে মানবতা; তাই সুতাকলের "মজুরের বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে ওঠে।" সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয় সহৃদয় সহমর্মিতায়।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ঈদের দিন পৌঁছাতে পারেনি মুসলমান মাঝি তার পরিবারের কাছে—"পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।" এই 'দুশমনরা' মুসলমান মাঝির শত্রু নয়, তারা দেশ-জাতি-সমগ্র মানুষের শত্রু। কায়েমি স্বাথসিদ্ধির জন্য তারা দাঙ্গা বাধিয়ে মেতে ওঠে নারকীয় উল্লাসে মনুষ্যত্বের অপচরে। কিন্তু শাশ্বত হয়ে রয়ে যায় বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষদুটির চির বিদায় সম্ভাষণ 'আদাব'।

গল্পকার সমরেশ সুতো কলের হিন্দু মজুর আর সুবইড়ার নায়ের মুসলমান মাঝি—এই চরিত্র দুটির কোন নাম দেন নি। তার কারণ হয়তো দাঙ্গার সময় এরা সব সংখ্যার হিসাবে পশুর মতো খুন হয়েছে। আর তার থেকেও বড় কথা নাম ব্যবহার করলেও তো এক[illegible] নাম হতো হিন্দু নামকরণ অনুযায়ী, অপরজনের মুসলমান রীতি মেনে। আসলে [illegible]

Scanned by CamScanner

সমরেশ বসু হয়তো নামের সূত্র ধরে উভয় সম্প্রদায়ের ভেদাভেদটুকুও রাখতে চাননি। তাদের একটাই পরিচয় তারা 'মানুষ'।

'আদাব' গল্পের ভাষা ব্যবহারও পরিস্থিতি এবং চরিত্র-উপযোগী। এ প্রসঙ্গে গল্পকার জানিয়েছেন "জীবন আর সহিত্যের মাঝখানে কোন আড়াল সৃষ্টি করা যায়না। ..... চরিত্র পরিবেশ বাদ দিয়ে সাহিত্যের প্রয়োজনে মেটে না।..... রক্তের যন্ত্রনাটাও যতখানি তীব্র ততখানি প্রকাশ হওয়া উচিত। দেখা-অদেখার মানুষটা তাতেই পরিস্ফুট।" (আর রেখোনা আঁধারে,' সমরেশ বসু দেশ-১৩৭৫) আদাব গল্পের ভাষাও চরিত্রানুযায়ী। তাই নেশার মাত্রা চড়লে সেঁতিয়ে যাওয়া দেশলাই না জ্বলে অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠে—"হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেতাঁইয়া।" আবার আতঙ্কিত মুহূর্তে সুতামজুর বলে ওঠে—"হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই।" দাঙ্গার কুপ্রভাব সম্পর্কে নায়ের মাঝির তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি—"মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তা বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমবায়?"

আদাব গল্পে মানবতার জাগরণের কাজটি কখনো প্রত্যক্ষভাবে লেখকের ভাষায় কখনো পরোক্ষভাবে চরিত্রের মুখে ঘটনার বর্ণনায় কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতির মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। মানবতার জয়গান দেখানো যে এই গল্পের মূল অভিপ্রায় তাই নারায়ণগঞ্জের সুতো কলের হিন্দু মজুর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে তার ক্ষণিকের মুসলিম বন্ধুটির জন্য—"ভগবান—মাঝি য্যেন বিপদে না পড়ে। .....আহা পোলা মাইয়্যার কত আশা নতুন জামা পড়বে। ( ) বেচারা বাপজানের পরাণ তো। .....সোহগ আর কান্নায় বিবি ভেঙ্গে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।" সুতাকলের মজুরের এই প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি তাই যে সমস্ত সৈন্য জ্ঞান শূন্য হয়ে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর তাদের রিভলবারের গুলিতে—শেষ শোনা গেছে মুসলমান মাঝির আর্তনাদ—"পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের জলেতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না। তা গো কাছে।" জাতপাতের ভেদকে অতিক্রম করে সুতোকলের শ্রমিক ও নায়ের মাঝি দাঙ্গার পটভূমিতে প্রীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও তাদের এই বন্ধু শেষ পর্যন্ত detouch হয়ে পড়েছে, তবে গল্পকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ধর্মান্ধতার বিষময় ফল ও পরিণতি দেখিয়ে পরোক্ষে বা প্রক্ষে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে গণজাগরণই গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্পকার দেখিয়েছেন দাঙ্গা বা জাতিভেদকে অতিক্রম করে বড়ো হয়ে ওঠে মানুষের জন্য মানুষের মমত্ববোধ। তাই সাম্প্রদায়িকতায় আবদ্ধ না থেকে গল্পটি পৌঁছে গেছে Humanism-এ।

Scanned by CamScanner